ছোট গল্প

ঘোর

-দীপন জুবায়ের

সকাল থেকে ভীষণ মাথা ধরেছে সীমার। ব্যাথা শুরু হয়েছে কাল রাতে, সকালে তীব্র হয়েছে। কাল সারারাত এক ফোটা ঘুম হয়নি। চোখ বুজে পড়ে ছিল বিছানায়। হাসান ওর অস্থিরতা লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেছিলো-তুমি এমন করছ কেন? শরীর খারাপ নাকি তোমার? খুব স্বাভাবিক সহজ প্রশ্ন। কিন্তু সীমা ভীষণ, চমকে উঠেছিলো। কোনরকমে বলতে পেরেছিলো নাহ্। মাথাটা ধরেছে একটু। আমি কি তোমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেব?

হাসান খুব আন্তরিকভাবে বলেছিলো। কিন্তু ওই মুহূর্তে হাসানের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো না। ভীষণ বিরক্ত লাগছিল। সীমা একটু বিরক্তি নিয়েই বলেছিলো-না না, এ এমন কিছু না। মাঝে মাঝেই হয়। তুমি ঘুমাও তো। ওর গলায় কি ছিল আর হাসান কি বুঝলো ও জানে না। হাসান আর একটাও কথা না বলে পাশ ফিরে শুয়েছিলো। কিছুক্ষন পর হাসানের মৃদু নাক ডাকার শব্দ। সীমা বিছানা ছেড়ে উঠলো। খুব অস্থির অস্থির লাগছে। একটা স্লিপিং পিল খাবে নাকি? বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিলো। আয়নায় বেশ সময় নিয়ে নিজের চেহারা দেখল। চোখের নীচে কি একটু কালি পড়েছে? কিছুদিন থেকে ভালো ঘুম হচ্ছে না। কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে রান্না ঘরে ঢুকলো ও। একগ্লাস পানি খেয়ে নিল ঢকঢক করে। তারপর আবার মনে হলো-একটা স্লিপিং পিল-খাওয়া দরকার। বেড রুমে ড্রেসিং টেবিলের উপর ওষুধের বক্স রাখা আছে। ও নি:শব্দে টেবিলের সামনে গিয়ে দাড়ালো। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ওষুধের বক্সটা বের করলো। ঘুমের ওষুধ এক আছে একটাও? হাসান নিতান্ত বাধ্য না হলে কোন ধরনের ওষুধ খায় না। ওর ঘুম বরাবরই খুব ভালো। বেডে শুয়ে চোখ বুজলেই নাক ডাকা শুরু করে। ওষুধের বক্স নিয়ে সীমা আবার পায়ে পায়ে রান্না ঘরে। ঢুকলো। লাইট জ্বালিয়ে খুজে পেতে একটা ঘুমের ওষুধ পাওয়া গেল। ওষুধ খেয়েও কি ঘুম আসবে? মনের ভেতর ভীষণ অস্থিরতা। ওষধ খেয়ে ও চুলায় চায়ের পানি চড়িয়ে অপেক্ষা করল কিছুক্ষন। রাতের এই সময়টা ওর খুব প্রিয়। এক কাপ-চা-নিয়ে বারান্দায় বসে অনেক সময় নিয়ে চা-খাওয়ার মজাই আলাদা। চারদিকে শুনশান নীরবতা। শুধু ও একা জেগে আছে। আচ্ছা এখন কি রবিকে কল করা ঠিক হবে? ওকি ঘুমিয়ে পড়েছে? দ্বিধাদ্বন্দে ভুগতে ভুগতে রবির নাম্বারে রিং দিলো ও। ওপাশ থেকে রবির কণ্ঠ ভেসে আসলো।

- কি ব্যাপার তুমি এত রাতে?
- কেন বেশী রাতে কল করা যায় না? আমার যদি এখন তোমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে কি করবো বল? সীমার গলায় একটু রাগের ভাব।
- নানা, আমি সেটা বলিনি। কিন্তু তোমার বর?
- তুমি তো জানোই এত রাতে ও ঘুমিয়ে কাদা হয়ে থাকে।
- তোমার ঘুম আসছে না? রবির প্রশ্ন।
- ঘুম আসলে কি তোমার সাথে কথা বলতাম? গাধা!
- হুম। আমি তো তোমার কাছে গাধাই। রবি হাসে।
- আচ্ছা শোনেন গাধা সাহেব আপনি কি কাল সকালে একবার আসতে পারবেন আমার বাসায়?

- ও মাই গড়! তোমার বাড়ী? তোমার রব যদি জানতে পারে তাহলে তো আমার খবর হয়ে যাবে। নারী নির্যাতন কেসও করে বসতে পারে। পরস্ত্রীর সাথে প্রেম করার শাস্তি।
- আরে না। তুমি আসবে সকাল দশটার পর। ও তখন কি বাসায় থাকে? বাড়ীতে শুধু আমি একা থাকি। ওর ফিরতে ফিরতে রাত হয়। স্কুল শেষে টিউশনি শেষ করে তারপর বাড়ী।
- লোভ দেখাচ্ছ? রবির গলায় কৌতুকের সুর।
- যদি বলি হ্যাঁ? আপনার কি আপত্তি আছে জনাব গাধা সাহেব?
- আরে না। কি যে বল তুমি। আমি তো এক পায়ে খাড়া, পারলে এক আঙুলে।
- শোন, বি সিরিয়াস। এখন তোমার সাথে ইয়ার্কি করার মত মুড নেই আমার। তোমার সাথে জরুরী কথা আছে।
- ওকে প্রিয়া, আই এ্যাম সিরিয়াস নাও। বল তোমার কি সমস্যা? রবির গলায় গাম্ভীর্যের সুর।
- না, এখন মোবাইলে বলা যাবে না। তাহলে তো তোমাকে কাল আসতে বলতাম না। যা বলার সামনা সামনি বলতে চাই।
- ওকে, আমি আসব কাল ঠিক দশটার পরপর।
- আচ্ছা, মনে রেখ। আমি এখন ফোন রাখব। সীমা বলল।
- আরে কেন, কেন? আর একটু কথা বলি না। রবির কণ্ঠে আকুতি।
- না, এখন আর কথা বলতে ভালো লাগছে না। রবিকে কিচু বলার সুযোগ না দিয়েই লাইন কেটে দিলো সীমা। মোবাইলের সুইচ অফ করে দিলো। ও জানে এখন রবি বারবার ওর নাম্বারে ট্রাই করবে। কিন্তু এখণ আর একটু কথা বলতে ভালো লাগছে না। মাথা ব্যাথা আরো বেড়েছে। বমি বমি লাগছে। সীমা আবার বাথরুমে ঢুকে চোখেমুখে অনেক সময় নিয়ে পানির ঝাপটা দিলো। এখনও ওষুধের ক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে। বরং অস্থিরতাটা আরও বাড়ছে। সেই সাথে ভীষণ মাথা যন্ত্রনা। ও আবার বারান্দায় চেয়ারে গিয়ে বসল। রাতের এই নিঝুম সময়টা একান্তই ওর। আশেপাশে কেউ নেই, বড় ভালো লাগে। রাস্তায় নিয়ম আলো, মাঝে মাঝে রাতপ্রহরীর বাঁশিল শব্দ। দুরে দু-একটা ঘেয়ো কুকরের ঘেউ ঘেউ ডাক। এই নিজুম রাতে একা বসে সীমার অতীতের কথা মনে পড়ে। ওর এই বিবাহিত জীবন তো কেউ ওর উপর জোর-জাপিয়ে দেয়নি। হাসনকে ভালোবেসে বাবা-মা সবাইকে ছেড়ে এককাপড়ে হাসানের সাথে সংসার করতে চলে এসেছিলো সীমা। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বাবা-মা কেউ তো ওর পক্ষে ছিল না। সমস্ত পৃথিবী একদিকে আর হাসান একদিকে। তবু ওর মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না হাসানের ব্যাপারে। বাবা-মা ওর বিপক্ষে থাকাটা ছিল খুব স্বাভাবিক। ওর সাথে হাসানের বয়সের ব্যবধান যে প্রায় এক যুগের। হাসান ছিল ওর প্রাইভেট টিউটর। তখন তেমন কিছুই করে না হাসান। দু-চারটে টিউশনি আর ছোট একটা স্কুলে বেগার খেটে সে কয়টা টাকা পকেটে আসত তাতে কোনরকমে ওর একার চলে যেত। মানুষটার মধ্যে আকর্ষণ করার মত এমন কিছু ছিল না। কিন্তু কেন যে সীমা দিনের পর দিন হাসানের উপর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলো কে জানে। এখন এমন ভাবলে খুব অবাক লাগে ও সীমার। কি ছিল লোকটার মধ্যে হাসানের বয়স যখন ৩৫, সীমার তখন মাত্র ১৮। মনের ভেতর উথাল পাথাল রোমান্স। রক্ষনশীল পরিবারের মেয়ে ছিল বলে বাইরের কোন ছেলের দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করার সুযোগ হয়নি ওর। তবে কি এই ছিল কারণ? হবে হয়ত। যে বয়সে মনে তীব্র প্রেম জেগেছিলো ওর সে বয়সে হাসান ছাড়া আর কাউকে তো ঘনিষ্ঠভাবে পায়নি ও। ওর ওই সময়কার বাধাভাঙা প্রেমানুভূতি হাসানকে আকড়ে ধরেছিলো। প্রথম প্রথম হাসান ব্যাপারটে মোটেও

পাত্তা দেয়নি। শিক্ষকসুলভ আচরনের বাইরে আর একটাও অপ্রয়োজনীয় কথা বলত না হাসান ওর সাথে। সত্যি কথা বলতে কি ও ভালোভাবে ওর চোখেল দিকে তাকাত না পর্যন্ত। হাসানের এই ব্যবহারে সীমা প্রথম প্রথম খুব মজা পেত। মনে মনে বলতো, দেখি তুমি কতদিন মহাপুরুষ সেজে থাকতে পার। আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না। ধরা তোমাকে দিতেই হবে।

- বারান্দা থেকে উঠে আবার রান্না ঘরে গেল সীমা। আবার চায়ের পানি চড়িয়ে দিলো চুলায়। এখন বেড়ে যাবার কোন মানে হয় না। অন্ধকারে ঘরে হাসানের পাশে শুয়ে সারারাত শুধু এ পাশ-ওপাশ করতে হবে। যত দিন যাচ্ছে শুধু নিজের প্রতি বিরক্তি বাড়ছে। হাসানের উপরত্ত কি বিরক্তি বাড়ছে না? হ্যা, আজকাল আর একটুও সহ্য করতে পারছে না ও হাসানকে। অথচ মানুষটা তো তার সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। তাহলে কেন এমন হচ্ছে? দিন দিন কেন এত শীতলতা ওদের সম্পর্কের ভেতর? চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে বসল ও। ওদের সংসারের এই দেড় বছর হয়ে গেল। এখনও কোন সন্তান আসে নি। ডাক্তারের সাথে কথা বলে যা বোঝা গেছে, ওদের সন্তান হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। সমস্যাটা ওর না, হাসানের। মানুষটা দিন দিন কেমন ম্যাদামারা হয়ে যাচ্ছে। ভালোকরে মুখের দিকে তাকালে কেমন যেন বুড়া বুড়া লাগে সীমার কাছে। জীবনে যদি একটাও স্বপ্ন না থাকে তাহলে মানুষ বাঁচবে কি নিয়ে। স্বপ্নহীন জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা কি বেঁচে থাকা? নিজের উপর ভীষণ রাগ হয় সীমার। বিরক্তির একেবারে শেষ সীমায় পৌছে ও আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলো। জীবনের কোন মানে খুজে পাচ্ছিল না ও একটা সময়। বেঁচে থাকার কোন মানে ছিল না ওই সময়টায়। জীবনের ওই চরম মুহুর্তে রবির সাথে পরিচয় হয়ে গেল। একটু একটু করে ভালো লাগতে শুরু করলো। রবিই ওকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলো। রবি সাথে দেখা না হলে সত্যিই হয়ত ও এতদিন বেঁচে থাকতো না। চরম মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে ও ভীষণভঅবে আকড়ে ধরলো রবিকে। রবির ভেতর কোন ভড়ং ছিল না। ওর বাইরে যেটুকু প্রকাশিত ওইটুকুই ঠিক। অন্তত সীমার তাই মনে হয়েছে। রবি একবারের জন্যও ওর বিবাহিত জীবন নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু সেটাই ছিল খুব স্বাভাবিক। সীমার কাছে ব্যাপারটা একেবারের স্বাভাবিক মনে হতো না প্রথম প্রথম। বরং মনের মধ্যে একটা বিশ্রী সন্দেহ ওকে কুরে কুরে খেত। দিনের পর ও অপেক্ষা করেছে কখন রবি নিজের থেকে ওই মোক্ষম প্রশ্নটা তুলবে। কিন্তু একবারের জন্যেও রবি কিছুই জানতে চাইলো না। তখন সন্দেহটা আরো গাঢ় হয়েছিলো সীমার। পুরা ব্যাপারটা ভন্ডামি নাতো? এই প্রশ্ন মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে একদিন ও নিজেই রবিকে জিজ্ঞেস করে ফেলল।
- আচ্ছা তুমি তো জানো আমি বিবাহিত। কিন্তু একবারের জন্য কোনদিন তুমি জানতে চাইলে না। আমার স্বামী কে? তার সাথে আমার কিভাবে বিয়ে হলো? বাবা-মায়ের পছন্দে নাকি প্রেমের বিয়ে। সীমার প্রশ্ন শুনে রবি হো হো করে হেসে উঠেছিলো।
- তুমি হাসছ কেন? একটা কি হাসির ব্যাপার? সীমা তীক্ষ্ণ চোখে রবির চোখে চোখ রেখেছিলো। হয়তো কিছু বোঝার চেষ্টা করছিল। ওর সন্দেহটাই কি সত্যি নাকি অন্যকিছু। কিন্তু রবি ব্যাপারটা পাত্তাই দিলো না। ও হাসতে হাসতেই বললো-দেখ। তুমি তো আমাকে ভালোবাসো তাই না?
- হু। সীমার চটজলদি সংক্ষিপ্ত উত্তর।
- তাহলেই তো সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া হয়ে গেল। ব্যাপারটা সহজ। তুমি আমাকে যদি সত্যি ভালোবাসা তাহলে তুমি তোমার স্বামীকে ভালোবাসা না। এটা তো ঠিক নাকি? সীমা নীরব থেকেছে। কোন উত্তর দেয়নি।

- আমি তোমাকে ভালবাসি এবং সত্যি ভালবাসি। আমার ভেতর কোন রকম ভনিতা নাই, তোমার ব্যাপারে। এখন তুমি যেভাবে চাবে সবকিছু সেভাবেই হবে। আমি কখনও তোমার উপর আমার কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেব না। প্রমিজ। সেদিনের পর থেকে ও রবির উপর আরো দুর্বল হতে শুরু করলো। নাহ্, ওর সন্দেহটা ঠিক ছিল না। আসলেই রবির ভেতর ভনিতা ব্যাপারটা খুজে পাওয়া যায় না। ও যখন যাই বলে সোজাসাপ্টা বলে ফেলে। এই ব্যাপারটা সীমার পছন্দ। খুব বেশী পছন্দ। আর একদিন সীমা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেছিলো।
- আচ্ছা? আমি যদি কখন তোমার কাছে চলে আসি তুমি বিয়ে করবে আমাকে?
- অবশ্যই করবো। আমি তোমাকে চাই সীমা। শুধু তুমি চাইলেই হবে। আমি সবসময় তোমার পাশে থাকতে চাই। সেদিন ওর বুকের ভেতর এক অজানা শিহরনহচ্ছিল।কি যে হচ্ছিল ওর, মুখে বলে ঠিক বোঝানো যাবে না কাউকে। আর ঠিক তখনই ওর মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেরেছিলো ও রবির সাথে চলে যাবে। হাসনের সাথে আর একটা দিনও থাকা অসহ্য হয়ে যাবে ওর পক্ষে। ও চলে যাবে খুব নিরবে। কোন গ্যাঞ্জাম না, কথা কাটাকাটি না। খুব স্বাভাবিকভাবেই ও চলে যাবে। এই শীতল সম্পর্ক নিয়ে সারাটাজীবন এক ছাদের নীচে থাকা ওর পক্ষে সম্ভব না। আর হাসানকে তো ও চেনে। খুব ভালোভাবে চেনে। চিৎকার, চেচামেচি, খোজাখুজি, তোলপাড় করার মত মানুষ হাসান না। তবে একটা ব্যাপার সীমা নিশ্চিত, ও চলে গেলে হাসান কষ্ট পাবে। ভীষণ কষ্ট পাবে মনে মনে। কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ থাকবে না। ওর বাইরেটা বড় বেশী নির্বিকার। সীমার এও মনে হয় দু'মাস-ছ'মাস কিংবা এক বছর পর হয়ত সব ভুলে যাবে হাসান। কিন্তু সত্যিই কি কোন মানুষকে পুরোপুরি ভালো যায়? তবে হাসানের মত মানুষরা যে কোন পরিস্থিতি দ্রুত মেনে নিতে পারে, যেটা সবাই পারে না।

  চা অনেক আগেই শেষ হয়েছে। তবুও সীমা অন্যমনস্কতায় এখনও চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। তুমুল উত্তেজনায় ওর ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে পাগল পাগল লাগছে। হাজার হোক দেড় বছরের সংসার তো। এই পরিচিত পরিবেশ, ঘরবাড়ি সব ছেড়ে কাল এক অজানা গন্তব্যে যাত্রা করবে ও। হ্যা, ও সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। আর এক দিনও দেরি করবে না। কালই চলে যাবে রবির সাথে। কিন্তু এখনও কিছুই জানানো হয়নি রবিকে। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই বটে। যার হাত ধরে এই সাজানো সংসার ছে চলে যাবে সীমা আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পর তাকেই এখনও জাননো হয়নি কিছুই। ছোট্ট একটা ভয় অবশ্য গুড়গুড় করছে বুকের ভেতর। যদি শেষ মুহুর্তে রবি বেকে বসে। ও যদি এখনই রাজি না হয়? সীমা আবার বাথরুমে গেল। চোখে মুখে পানি দিল। মাথায় পানি ঢালল। একটা লম্বা গোসল দিতে পারলে বোধ হয়। একটু ভালো লাগত। কিন্তু এখন গোসল করলেই ও অসুস্থ হয়ে পড়বে। ছোটবেলা থেকে টনসিলটা বড় জ্বালাতন করছে। যখন বৃষ্টিতে ওর বন্ধুরা ভিজে আনন্দ করতো তখন ওকে স্রেফ দর্শক হয়ে দাড়িয়ে থাকতে হয়েছে সেই বাল্যকাল থেকে।

  সীমা বেড় রুমে ঢুকেই শুনতে পেল হাসানের নাক ডাকার শব্দ। ও পায়ে পায়ে হাসানের মুখের সামনে গিয়ে দাড়ালো। ঘরের জানালা দিয়ে ল্যামপোষ্টের মৃদু আলোয় ও হাসানের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। হাসান গভীর ঘুমে। ঘুমন্ত মুখে ওকে ভীষন অসহার লাগছে। নিজের অজান্তেই সীমার বুক চিরে একটা দীর্ঘ:শ্বাস বেরিয়ে আসল। এই মানুষটাকে একসময় ও কি তীব্রভাবেই না ভালোবেসেছিলো। এই মানুষটার জন্যেই বাবা-মা সবাইকে ত্যাগ করে চলে এসেছিলো এক অনিশ্চিত জীবনের দিকে। কিন্তু আজ আর সেই ভালবাসার বিন্দু পরিমান অবশিষ্ট নেই ওর ভেতর। যেটা আছে

সেটা স্রেফ মায়া। মানুষ একটা কুকুর পুষলে ও তো তার প্রতি মায়া জন্মায়। আর এতো রক্ত মাংসের জলজ্যান্ত মানুষ, ওর স্বামী। যাকে কৈশরের ভালবেসেছিল, যার সাথে দেড় বছর সংসার করেছে।

দেয়াল ঘড়িতে টুং করে মৃদু শব্দ হলো। রাত তিনটা। সীমা ধীরে ধীরে ড্রোসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাড়ালো। মৃদু আলোয় আয়নায় ভেতর ওর পরিষ্কার ছবি দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা অবয়ব দেখা যাচ্ছে। সীমার মনে হল আয়নায় ভেতর অন্য কেউ দাড়িয়ে একদৃষ্টিতে ওকে দেখছে। হঠাৎ ওর মনে হলো আয়নার ভেতরের ওই ছায়াটা ওকে প্রশ্ন করলো।

- কি অনুতাপ হচ্ছে? মায়া লাগছে তোমার?
- নানা। কিসের অনুতাপ? আমি যা করছি। খুব ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে করছি। সীমা বিড়বিড় করে বলল।
- তুমি কি সত্যি বলছ সীমা? নিজেকে ঠকাচ্ছো না তো?
- নাহ্। মোটেও না। আমি যা করছি নিজের বুদ্ধিতে করছি। ঠকলেও আমার কোন দু: থাকাবে না।
- এই মানুষটাকে বিনা কারণে ছেড়ে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? ওর তো কোন দোষ নাই। বল, কাজটা কি ঠিক করছ?
- সীমা এবার আর কিছু বলল না। আয়নায় সামনে থেকে নীরবে সরে আসলো। মনের দুর্বলতা। এসবের কোন মূল্য নেই এখন আর জীবনে। আমার জীবনটা একান্তই আমার। আমি যেভাবে ভালো থাকব সেটাই করবো। কারও কাছে জবাবদিহি করতে যাব কেন? সীমা মনে মনে এসব কথাভাবে। ও জানে এই সংসার ছেড়ে না বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এসব হিজিবিজি চিন্তায় মাথা টালমাটাল হাবে। সবসময় সব দুর্বলতা প্রশয় দিতে হয় না। ও খুব সন্তর্পনে বেড়ে এসে শুয়ে পড়ে। ঘুম তো হবে না সারারাত। তবুও চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা দরকার। মাথা যন্ত্রনাটা যাচ্ছে না। কিন্তু খুব আশ্চর্য ব্যাপার শোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ও গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। ঘুম ভাঙলো খুব ভোরে হাসানের ডাকে।
- এই ছিল সীমার গতরাতের ঘটনা। বেড ছেড়ে ধড়মড় করে উঠে অন্যান্য দিনের মতই ও রান্না ঘরে ঢুকল। খুব স্বাভাবিকভাবেই হাসানের সকালের নাস্তা তৈরী করলো। হাসানের মর্নিং স্কুল। বেশ সকাল সকাল বেরিয়ে যেতে হয়। হাসান বেরিয়ে যাওয়ার সময় বললো-সীমা আমি গেলাম।
- আচ্ছা, যাও। সীমার গলাটা কি একটু কেপে গেল? রাতে বাড়ী ফিরে। হয়ত হাসান আর সীমাকে দেখতে পাবে না। এই দেখাই হতে পারে শেষ দেখা। সীমার একবার মনে হলো হাসানকে ডাকে। কিন্তু পারল না। চোখের সামনে থেকে মানুষটা যাওয়ার পরই খুব অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। সীমার দু-চোখ জলে ভরে গেল। কেন এমন হলো? একি শুধুই মায়া? হবে হয়ত। ও চট করে চোখের জল মুছে ফেলল এখন অনেক কাজ। ব্যাগে ওর জামা-কাপড় গুছাতে হবে। একটা ফ্রেশ গোসল দিতে হবে। যদি মাথা ব্যাথাটা একটু কমে। ও ঝটপট ব্যাগ গুছিয়ে ফেলল। একসাথে দুটা নাপা খেয়ে গোসলে ঢুকল। গোসল সেরে নিজের জন্য এককাপ কড়া লিকারের চা বানিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসল। এখন শুধু অপেক্ষা, আর কোন কাজ নেই এখন।। একটু একটু করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে সীমা। মাথা ব্যাথার একটু আরাম পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা আজ কোন শাড়ীটা পরা যায়? হঠাৎ মনে পড়লো রবি ওকে একটা শাড়ী গিফট্ করেছিলো গত জন্মদিনে। কিন্তু একবারও খুলে দেখেনি ও। পরা তো দুরের কথা। আজ ঐ শাড়ীটা পরলে কি রবি খুশী হবে? ওকে একটু চমকে দেওয়া যাবে। হ্যা, ঐ শাড়ীটাই পরতে হবে। বড় বড় কয়েক চুমুকেই চা শেষ করে ও বেড রুমে ঢুকলো। ব্যাগ থেকে গিফটের প্যাকেটটা বের করে ছিড়ে ফেলল। শাড়ীটা বের করে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে সীমা। রবি কিভাবে জানলো ওর প্রিয় রং নীল? ও

তো কখনও বলেনি রবিকে। খুবই অবাক ব্যাপার। খুব যত্নে শাড়ীটা পরে ফেলল ও। সাথে ম্যাচিং করে ব্লাউজ, টিপ, লিপস্টিক। আয়নায় অনেক সময় নিয়ে নিজেকে দেখল।

- দশটা বেজে গেছে। রবি আসবে তো? বাড়ীর ঠিকানা ওকে জানিয়ে দিয়েছে সীমা। বুক ধড়পড় করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। ওকে দেখে খুশী হবে তো রবি। একটা ছোট্ট চিঠি লিখতে বসল ও। হাসানকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়া। যেন অযথা খোঝাখুজি না কে। চিঠি লিখে শেষ করে টেবিলের উপর চাপা দিতে যাবে ঠিক সে সময় কলিংবেলের শব্দ। সীমা দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। হ্যা রবি।
- আরে আমি কি ভুল দরজায় নক করলাম নাকি? আপনি কি সত্যিই সীমা? নাকি নীলপরী?
- ভেতরে এসো, ফাজলামি করতে হবে না। সীমা কৃত্রিম রাগের ভাব আনলো গলায়।
- এই তোমাদের মেয়েদের এক দোষ, একটু প্রশংসা করা যাবে না। তোমাকে আজ সত্যিই নীলপরির মত লাগছে, রবি ভেতরে ঢুকে বসার ঘরে বসল।
- তুমি চা খাবে? আমি খাব। সীমা বলল।
- অবশ্যই খাব। নীলপরীর হাতের চা কেন বিষ খেতেও রাজি আছি।
- আচ্ছা, বস পাঁচ মিনিট, আমি চা নিয়ে আসি। সীমা রান্না ঘরে ঢুকলো। খুব দ্রুত দু মগে চা নিয়ে এসে বসল রবির সামনে।
- চা কেমন হয়েছে?
- অসাধারণ। রবির এই উচ্ছল ভাবটাই সীমাকে আকর্ষণ করে বেশী।
- আচ্ছা, শোন। আমি এখন খুব সিরিয়াস একটা কথা বলবো। তুমি কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। রাজি থাকলে বলবে হ্যা, রাজি না থাকলে না। এক কথায় শেষ। আমার কথা বুঝতে পারছ? রবি একটু নড়েচড়ে বসে নীরবে চাটা শেষ করলো। সীমার মুখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে বলল, হ্যা, বল। আমি সিরিয়াস।
- সীমা একটু সময় নিয়ে শুরু করলো।
- রবি আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আর হাসানের সাথে থাকব না। আর একদিনও না। আমি খুব ঠান্ডা মাথায় ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ওর সাথে কনটিনিউ করা আর সম্ভব না আমার পক্ষে। আমি আজ, এখনই তোমার সাথে চলে যতে চাই। আমি রেডি, এখন বাকীটুকু তোমার উপর নির্ভর করছে। তুমি কি পারবে এখনই আমাকে নিয়ে যেতে? সীমা তীক্ষ্ণভাবে রবির চোখে চোখ রাখল।
- সীমা তুমি জান, আমি কোন কিছুর বিনিময়েই তোমাকে হারাতে চাই না। তুমি যদি চাও এখনই আমার সাথে চলে আসতে পার। আমি খুশী হব তোমাকে পেলে। কিন্তু তোমার স্বামী? তার কথাটা কি একবার ভেবে দেখা দরকার না?
- সীমা বলল, আমি একটা চিঠি লিখে সব পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি ওকে। আর ও অন্য দশজনের মত না। কোন ঝামেলা ওর দিক দিয়ে হবে না, তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। রবি মুখ থেকে উত্তর পাওয়ার আশায় সীমা ওর দিকে তাকায়। রবির মুখ কি একটু মলিন, বিবর্ণ হয়ে গেল? বোঝা যাচ্ছে না। সীমা চাতক পাখীর মত তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। একটুক্ষন চুপ থেকে রবি জোর গলায় বলল।
- আচ্ছা, চল। এখনই তুমি আমার সাথে যাবে। তোমাকে হারাবার মত সাহস আমার নাই। তোমাকে পাওয়ার শর্তে আমি যে কোন সমস্যার সামনে দাড়াতে পারি। সীমার বুক থেকে যেন ভীষণ ভারী একটা পাথর নেমে গেল। এই মুহুর্তে নিজেকে পৃথিবীরসবথেকে সুখী মানুষ মনে হচ্ছে। ওর মনে আর

বিন্দুমাত্র গ্লানিবোধ নেই। ও যেন নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছে। এর আগের জীবনটা যেন ওর ছিল না, অন্য কারও। ওর এখন সেরকমই মনে হচ্ছে। ও যেন অণ্য কোন পৃথিবীতে চলে গিয়েছে। স্বাপ্নিক গলায় সীমা বলল। রবি, এখন থেকে তুমি আমাকে অন্য একটা নামে ডাকবে। আমি এখন থেকে আর সীমা না। অন্য কেউ হতে চাই। রবি বলল-তোমার অন্য একটা নাম তো দিয়েই দিলাম। নীলপরী। আরও ছোট করে পরী। তুমি আমার পরী। এখন থেকে তুমি শুধুই পরী। রবি উঠে দাড়ালো। তারপর বলল, চল। আর দেরি করা যাবে না। সবকিছু নতুন করে সাজাতে হবে। আমার কতকাজ বাকী আছে। সীমাও উঠে দাড়ালো। বেড় রুম থেকে ওর জামা কাপড়ের ব্যাগটা এনে রবিকে বলল, চল।

- রবি ওর হাতের ব্যাগের দিকে তাকিয়ে বলল, ওর ভেতর কি?
- কেন আমার জামা-কাপড়। রবি এবার হো হো করে হেসে উঠলো। সীমা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল,-হাসির কি হলো?
- তুমি বোঝা নি? রবির প্রশ্ন।
- নাহ্। সীমার বিস্ময় কাটেনি।
- ওগুলো তো তোমার জামা-কাপড় না। ওগুলো সব সীমার। তুমি তো সীমা না, পরী। সীমার কাপড় পরী পরবে কেন? এগুলো রেখে দাও। ওগুলো নিলে আমি তোমাকে সাথে নেব না। আমি পরীকে নেব, শুধু পরীকে।
- সীমার বুকের ভেতর আবার কি যেন হলো। ও ব্যাগটা হাত থেকে ফেলে দিলো। ওর আবার মনে হলো এ মুহুর্তে ওই পৃথিবীর সব থেকে সুখী মানুষ। ওরা যখন রিকশায় পাশাপাশি বসল, তখন আড়চোখে সীমা শেষবারের মত ওদের বাড়ীটার দিকে ফিরে দেখল। বাড়ীটা ওর কাছে অচেনা লাগছে এখন। ওর মনে হল এই দেড়টা বছর ও যে হাসান নামের একজন মানুষের সাথে এই বাড়ীতে কাটিয়েছে সেটা সত্যি ছিল না। এটা একটা দু:স্বপ্নের ঘোর ছিল। ঘোরের ভেতর কেটে গেল এতগুলো দিন।
- পরী? রবির ডাকে সীমা সম্বিৎ ফিরে পেল। সত্যিই তো ও এখন এসব ভাবছে কেন? ওতো এখন আর সীমা না, পরী।

-------০-------

দীপন জুবায়ের
২৫/১ , জিগাতলা
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
মোবাইল: ০১৭১১২৬৭৭৭৫
E-mail: dipanjubaer@yahoo.com